দাসেরা কেমন জীবন কাটাত?

দাসেরা কেমন জীবন কাটাত?

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

সূচীপত্র

মানুষ বেচা

বাচ্চাটার বয়স ছিল মোটে দশ বছর। সে ছিল কালো। এক নাগাড়ে কাঁদছে তার মা। আর পাশেই দাঁড়িয়েছিল সে। তাদের দুজনকেই বেচা হবে এবার। তার বাবাকে সে একটু আগেই দেখেছে একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির কাছে বিক্রি হয়ে যেতে। সেই ব্যাক্তিটি তার দিকে এমন করে চাইছিল ঠিক যেন সে একটা জানোয়ার। তার পরই তার বাবাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল সে। আর তার বাবা পিছিন ফিরে তার ছোট্ট পরিবারের দিকে বার বার তাকাতে তাকাতেই আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। এবার তাদের পালা। তার মাকে আর তাকে এবার বেচা হবে। আলাদা আলাদা ভাবে......

১৫০ বছর আগের আমেরিকার এই দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে, ক্রীতদাসেদের জীবনে নিজেদের পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটাই ছিল সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা।

তাদের জীবনে মৃত্যুই যেন ছিল একমাত্র মুক্তি – সব দুর্দশা থেকে।

দাসপ্রথা মানব জীবনের ইতিহাসের গোড়ার দিক থেকেই প্রচলিত ছিল। আর হয়ত এখনো পৃথিবীর কোনো না কোনো প্রান্তে তা আজও হয়ত বা আছে, কোনও না কোনো ভাবে। তবে এই প্রথা চরম বিস্তার লাভ করে ১৬০০ সালের গোড়ার দিকে। আফ্রিকার থেকে অনেক কালো মানুষেদের নিয়ে যাওয়া হয় আমেরিকার দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে, ওয়েস্ট ইন্ডিসে আর উত্তর আমেরিকার ব্রিটিশ অধ্যুষিত কলোনিগুলিতে। ১৭৭৬ সালে যখন এই কলোনিগুলো নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করে তখন সেখানে দাসেদের ছড়াছড়ি। এদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিল দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে । ১৮৬০ সালের মধ্যে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে প্রায় ত্রিশ লাখের মত দাস ছিল। সেখানে তামাক, চিনি, চাল আর বিশেষত তুলোর ক্ষেতে কাজ করার জন্য প্রচুর দাসেদের প্রয়োজন ছিল।

উপরেঃ এটি একটি মাল্‌ভর্তি জাহাজ ১৬১৯ সালে জেমস টাউনে এসে পৌঁছেছে। এইটা সেই সময় যখন আমেরিকা আর আফ্রিকার মধ্যে দাস কেনাবেচা ফুলেফেঁপে বাড়তে শুরু করে,

দাস ব্যবসা

১৪৯২ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের এই নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের ঠিক পঁচিশ বছর পর প্রথম এক অনিচ্ছুক দাসকে আমেরিকায় নিয়ে আসা হয়, স্পেনের এক উপনিবেশে। এরপরই এর দেখাদেখি অন্যান্য দেশও এই মানুষ বেচা কেনার ব্যবসায় নামে- পর্তুগীজ, ফ্রেঞ্চ, ওলন্দাজ আর ইংরেজরাও বাদ যায় না।

সমুদ্রপথে যেসব দেশ ব্যবসা বাণিজ্য করত তারা যখন সব ওয়েস্ট ইন্ডিজে নিজেদের উপনিবেশ গড়ে তুলতে শুরু করে, সেই সময় ১৬০০ সাল নাগাদ এই ব্যবসা খুবই রমরম করে বেড়ে ওঠে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছিল চিনির ঘাঁটি।

আঠারশ শতাব্দীতে, বিশেষত ব্রিটিশদের দ্বারা এই ব্যবসা সুপরিকল্পিত ভাবে সংগঠিত হয়। এটা সম্ভব হয় যখন আফ্রিকায় যারা রাজত্ব করতেন তারা তাদের দেশের মানুষদের ইউরোপীয়দের হাতে বেচতে রাজী হয়।

ঠিক হয় একটা জাহাজ ব্রিটিশ বা কোনো ইউরোপীয় বন্দর থেকে আফ্রিকা যাবে। তাতে ভরা থাকবে সেখানের স্থানীয় নেতা বা রাজার জন্য অনেক ভেট। তার বদলে তিনি দেবেন অসংখ্য দাস।

আশপাশের বন্দর থেকেই তাদের তোলা হয়।

বন্দরের ঘাটে লাগোয়া জমিতে সেই দাসেরা অপেক্ষা করত যতক্ষন না তারা নিলাম হয়ে যায়।
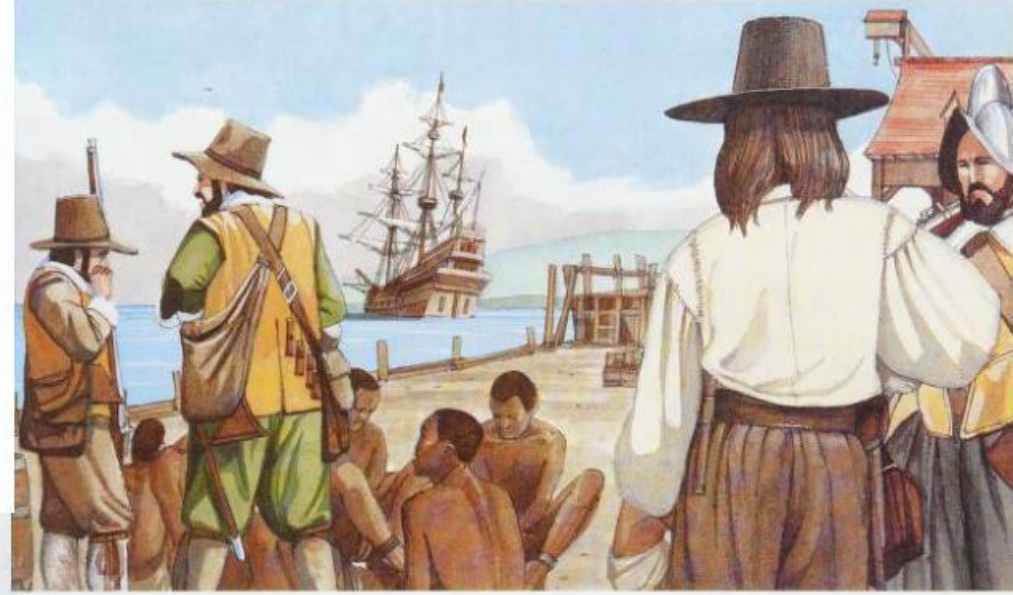
অনেক হাত ঘুরে চলত এই বেচাকেনা। নানান হাত ঘুরে অবশেষে তাদের নেতা বা রাজার কাছে টাকা পৌঁছাত।

তারপর নারকীয় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আটলান্টিক পেরিয়ে তাদের বেচা হত। সেই জাহাজগুলো সব তারপর চিনি, তুলো, তামাক, আর অন্যান্য সামগ্রীতে বোঝাই হয়ে ফিরে আসত ইউরোপে।

এই বাণিজ্য ত্রিকোণ বাণিজ্য বলে পরিচিত ছিল। এই নামের মাহাত্ম্য ম্যাপের দিকে চাইলেই বোঝা যাবে।
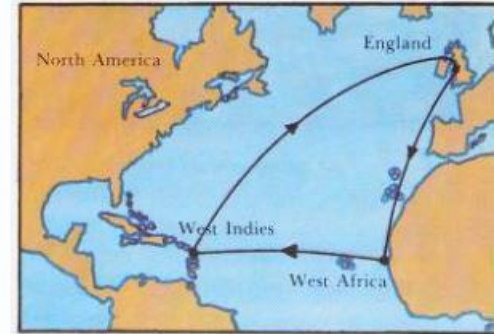
ইউরোপ, আমেরিকা আর আফ্রিকার মধ্যে চলত এই ত্রিকোণ বাণিজ্য।

সাগর পাড়ি

এইসব দাসেদের আটলান্টিক পেরিয়ে এক ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হত আমেরিকায়।

দাসেদের এই জাহাজগুলো ছিল এককেটা ভাসমান নরক। সবচেয়ে বড় জাহাজে ৭০০ জনের মতন দাস ভরে নিয়ে যাওয়া হত। তাদের সবাইকে ডেকের নীচের খোলে পোরা হত। এককেজন পুরুষ দাসেদের আরেকজনের সাথে চেন দিয়ে বাঁধা হত আর ৫ ফুট উঁচু বা তার ও ছোট এক কুঠুরিতে রাখা হত। একজনের জন্য বরাদ্দ জমি ছিল ঠিক তার কফিনের সমান মাপের। মহিলা আর শিশুদেরও গাদাগাদি করে ভরা হত অন্যখানে, তবে তাদের চেন দিয়ে বাঁধা হত না।

সবাইকে ডেকের উপর নিয়ে যাওয়া হত শুধু খেতে- তাও মাত্র দিনে দুই বার। তাদের দৈহিক কসরৎও করানো হত। তাদের বলা হত লাফাতে, ঝাঁপাতে। আর কথা না শুনলে জুটত চাবুকের বারি। যখন তারা এই সব করত তখন নীচে তাদের থাকার কুঠুরিগুলো পরিষ্কার করে রাখা হত। তারপর তাদের আবার এনে পোরা হত সেখানে।

কোনো কোনো জাহাজে এত জনকে পোরা হত যাতে কিছুজন এইভাবে অতি কষ্টে মরে গেলেও আমেরিকা পর্যন্ত যথেষ্ট সংখ্যায় দাসেরা পৌঁছায়। আর অন্য জাহাজগুলোতে কম সংখ্যায় দাসেদের নিয়ে যাওয়া হত এই ভেবে যাতে তারা যেতে যেতে অমানবিক কষ্টের কারণে মরে না যায়। তাদের বেচেই তো লাভ করবে একদল মানুষ!

এই আফ্রিকা থেকে আমেরিকা যেতে মোটামুটি দিন পাঁচেক লাগত। কখনো কখনো তারো বেশী লাগত। দাসেদের জন্য তাদের দাসত্বের জীবনের কষ্টের থেকেও এই জাহাজের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী ভয়ানক ও কষ্টদায়ক ছিল।

উপরেরটি একটি দাসবাহী জাহাজ, যাতে দাসেদের ঠেসে পুরে আটলান্টিক পেরিয়ে এমন ভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যা এক দুঃস্বপ্নের মত

ডাইনে একটি দাস বেচার বিজ্ঞাপন দেওয়া পোস্টার

TO BE SOLD on board the Ship *Bance Yland*, on tuesday the 6th of *May* next, at *Afhley-Ferry*; a choice cargo of about 250 fine healthy

NEGROES,

juft arrived from the Windward & Rice Coaft. —The utmoft care has already been taken, and fhall be continued, to keep them free from the leaft danger of being infected with the SMALL-POX, no boat having been on board, and all other communication with people from *Charles-Town* prevented.

Auftin, Laurens, & Appleby.

N. B. Full one Half of the above Negroes have had the SMALL-POX in their own Country.

যাত্রাপথের শেষের কদিন দাসেদের একটু ভাল খেতে দেওয়া হত। চেন থেকে কেটে যাওয়া ঘা, ফোসকা, আর মারের দাগ গুলোকে বারুদ আর মরচের গুড়ো দিয়ে ঘষে ঘষে ঢেকে দেওয়া হত, যাতে বিক্রির বাজারে তাদের বেচে দাম পাওয়া যায়। আঘাত বা ক্ষত দেখা গেলে যদি তাদের দর কমে যায়!

নিলাম

একজন দাস- যেন এক জানোয়ারের মত, কিম্বা একটা আসবাবের মতন। বা এক বস্তা তুলোর মত যাকে তার মালিক যখন খুশী বেচতে পারেন।

স্বাভাবিক ভাবেই বেচার আগে দাসেদের একেবারে চকচকে করে বেচা হত। তাদের নতুন জামা দেওয়া হত। তাদেরকেও পরিষ্কার করে ঝকঝকে করে বেচার জন্য প্রস্তুত করা হত।

যাদের বয়স বেশী, তাদের পাকা চুল তুলে বা পাকা চুল কালো করে দেওয়া হত বেচার আগে, যাতে তাদের দেখতে ছোট লাগে। যারা কিনতে আসত, তারা এদের ঠিক জন্তু জানোয়ার কেনার সময় যেমন করে দেখে সেরকম করে পরীক্ষা করত। তাদের পিঠটাও ভাল করে পরীক্ষা করে নেওয়া হত। দেখা হত এদের শিরদাঁড়াটা ঠিক আছে নাকি। না চাবুকের বারি খেয়ে বেঁকে গেছে। যদি বেঁকে গিয়ে থাকে তাতে এইটাই প্রমাণ হয় যে তারা সবসময় গণ্ডগোল পাকাত, ঠিকমত নির্দেশ পালন করত না, তাই মার খেইয়ে খেয়ে এই হাল। এই বেচার বা নিলামের খবর সব স্থানীয় কাগজে দেওয়া হত বা দেওয়ালে দেওয়ালে প্রচুর পোস্টার পরত। তাই প্রচুর বিক্রেতার সমাগম হত এই দাস নিলামের সময়।

জোসাই হেন্সনঃ সে যখন ছোট ছিল তখন কিভাবে সে বিক্রি হয়ে যায় তার বিবরণ সে দিয়েছে। তার মালিক যখন মারা যায়, তার সব জমি বিক্রি করার প্রয়োজন হয়। প্রথমে তার ভাই আর বোন বিক্রি হয়, তারপর তার মা। বিক্রেতার পায়ের উপর উপুর হয়ে পড়ে সে তখন শুধু মিনতি করতে থাকে যাতে তার ছোট ছেলে জোসাইকেও কিনে নেন। কিন্তু বিক্রেতা কিছুই শুনলেন না, উলটে তাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিলেন।

নীচে এক দাসেদের পরিবারের নিলাম হতে দেখা যাচ্ছে।

সব পরিবারের মধ্যে এই এক ভয় কাজ করত, নিলামের সময় তাদের পরিবারের সবাইকে আলাদা হয়ে যেতে হবে।
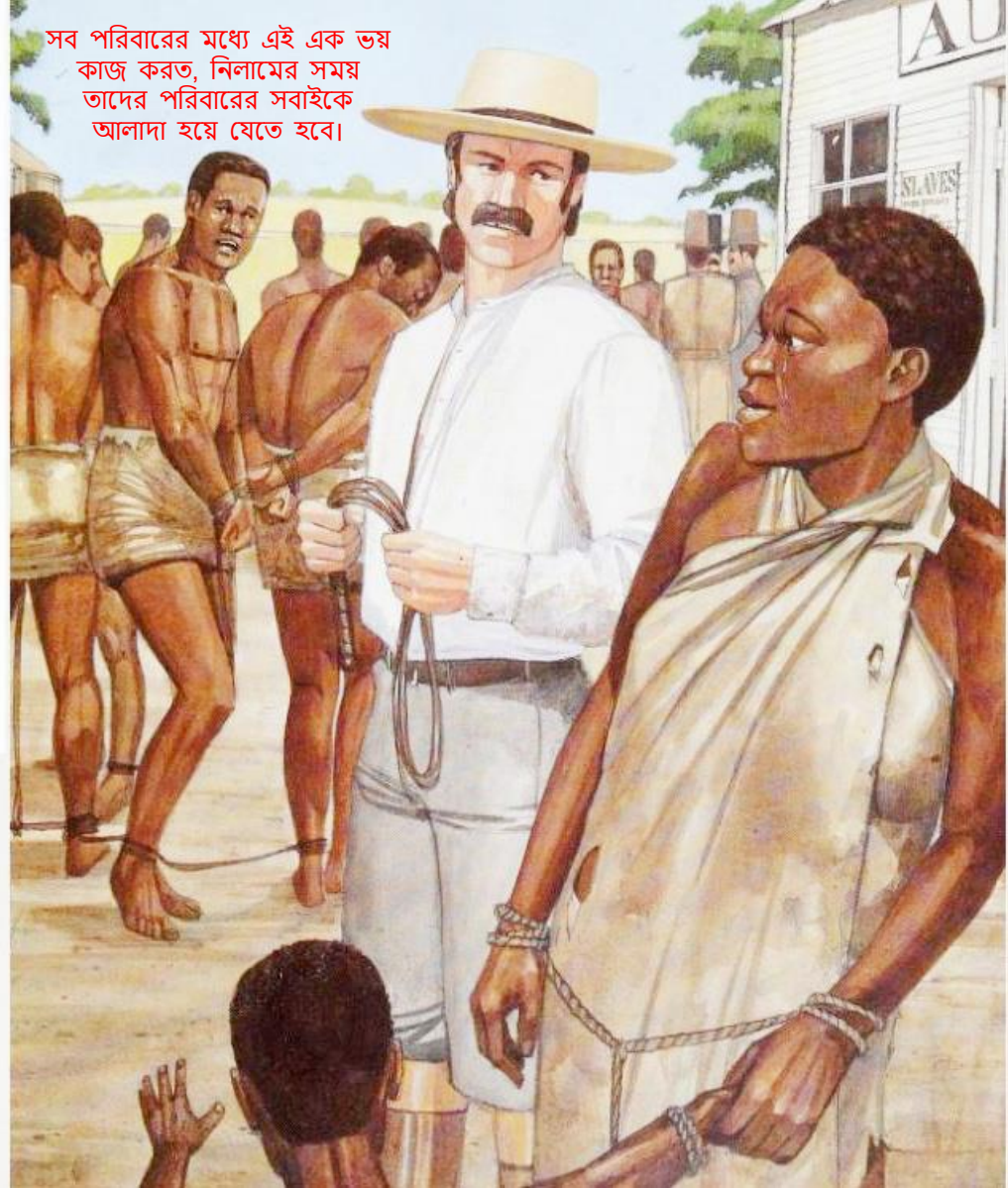
দাসেদের মালিক

দাসত্ব এক অত্যন্ত নৃশংস প্রথা, কিন্তু সব জমিদার প্রভুরা একরকম ছিল না। দয়ালু প্রকৃতির যারা ছিলেন তাদের কাছে থাকলে দাসেরা গরীব শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের থেকে অনেক ভালভাবে জীবন কাটাতে পারত। কোনো কোনো দাস যারা বাড়ীর কাজ করত, তারা ভাল কাজ করলে, তাদের মুক্তও করে দেওয়া হত।

কিন্তু সবাই তো একরকম ছিল না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এত কঠিন আর নৃশংস ছিল যে তাদের কাছে যে দাসেরা কাজ করত তাদের অন্যায় অত্যাচার করত আর কখনো কখনো তাদের মেরেও ফেলত। কিন্তু ক্রীতদাসেদের তো কোনো অধিকার ছিল না, প্রতিবাদ করার তো নাই। তার জীবন ও মরণের সব জিম্মা ছিল তার প্রভুর কাছে, তার মালিকের কাছে।

জো' র মনে পড়ে কিভাবে তার মালিক তাকে বার বার নিজের বন্ধুর কাছে যে দাসেরা থাকত তাদের দেখাশুনা করার জন্য ভাড়া দিত। সে এত ভাল কাজ করত দেখে তাকে তার মালিকের কাছ থেকে সেই বন্ধু মোটা টাকা দিয়ে পরে কিনেও নিয়েছিল। কিন্তু নতুন মালিকের কাছে পরে সে জানতে পারল সে তাকে চাবুক মারার জন্যই কিনেছে। একদিন অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে জো কাতর ভাবে জানতে চায় এত ভাল কাজ আর সব আজ্ঞা পালন করার পরেও সে কেন এমন চাবুক মারে। এর উত্তরে তার নতুন মালিক জানায় যে, " সব নিগারদের এটা জানতে হবে যে তারা হল চাকর আর তাদের প্রভু বা মালিকের হাতে মার খাবার জন্যই জন্ম হয়েছে।" এর পরে সেই মালিক এও জানায় যে সে যদি বাধা দেয় তাহলে তাকে চাবুকের বারি মারতে মারতে মেরেই ফেলা হবে।

জো চাবুকাঘাত তো বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু সে ঠিক করে নিয়েছিল যে সে উত্তরের কোনো রাজ্যে পালিয়ে যাবে। সেখানে দাসত্ব প্রথা ততদিনে উঠে গেছে। আর সে তা করেওছিল। কিন্তু জো অতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন ছিল যে এভাবে পালাতে পেরেছিল।

পারিবারিক জীবন

আর সবার মত দাসেদের কাছেও পরিবার অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু দাসেদের জীবনে বিবাহ এক যন্ত্রনাদায়ক পরিণাম বয়ে আনত। কারণ এক তো এই বিবাহ আইনসিদ্ধ ছিল না। আর দ্বিতীয়ত দাসেদের পরিবারের সবাইকে তো পরে বিচ্ছিন্নই হতে হত। আলাদা আলাদা করে বেচে তাদের পরিবারকে ভেঙ্গে দেওয়া হত।

দাসেদের বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আরও আরও অনেক সংখ্যায় দাস তৈরি করা। অন্তত শ্বেতাঙ্গদের চোখে তো তাইই। সেই দাসেদের ঘরে জন্ম নেওয়া ছেলেমেয়েদের তাহলে অনেক কাজে লাগানো যাবে অথবা বেচে দেওয়া যাবে। ভাগ্য ভাল থাকলে, মানে মালিক ভাল হলে অবশ্য অবস্থা এত খারাপ হত না।

শ্বেতাঙ্গ জমিদার বা পর্যবেক্ষকেরা কালো মেয়েদের উপর অনেক রকমের অত্যাচার ও অশালীন ব্যবহার করত। তাদের যখন সন্তান হত তাদের আবার দাসেদের বাজারে বেচে দেওয়া হত।

এক দাস পরিবার, তাদের ঘরের সামনে

বুকার ওয়াশিংটন, এক ক্রীতদাস যিনি পরে শিক্ষক হয়েছিলেন।

বুকার ওয়াশিংটনের এখনো মনে পরে কিভাবে তিনি আর তাঁর পরিবার কখনো এক টেবিলে খাবার খান নি। তাঁর ছেলে মেয়েদের খাবার দেওয়া হত ঠিক 'যেভাবে একটা বোকা অবলা জানোয়ারকে খেতে দেওয়া হয়। তাও খাবার মানে এক টুকরো রুটি আর এক ছোট টুকরো মাংস।' তিনি পরে শিক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন আর এইসব বঞ্চিত মানুষদের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন।

অনেক ক্রীতদাসেরাই অনেক কম বয়সে মারা যেত। এক কামরার ঝুপড়িতে কত পরিবার একসাথে জীবাণুর সাথে, ঝড়ে- জলে, বৃষ্টিতে, ঠান্ডায় তারা গাদাগাদি করে থাকত। কারোর কোনো ছোঁয়াচে রোগ হলে তা ছড়িয়ে পড়ত দাবানলের মত। গড়ে প্রতি একশ জনের মধ্যে মাত্র চার জন ৬০ বছর পর্যন্ত বাঁচত।

উপরে আর নীচে দেখা যাচ্ছে এক কামড়ার ঝুপড়ি যাতে একের বেশী ক্রীতদাসেদের পরিবার থাকত। খুবই ঠান্ডা আর কোনোরকমে বানানো হত ঘরগুলো।

ক্ষেতের কাজ

সাধারণত ১২ বছর থেকেই তারা ক্ষেতের কাজে লেগে যেত। কেউ কেউ আবার শুরু করে দিত ১০ বছর বয়সেই। সতেরশ আর আঠারশ শতাব্দীতে তারা বেশীরভাগই প্রধানত দক্ষিণের তামাক, ধান, চিনি আর নীল চাষের ক্ষেতে কাজ করত। ১৭৯৩ সালে, এলি হুইটনি এক আজব মেশিন আবিষ্কার করেন – তুলো ধুনার মেশিন। এর আগে তুলোর বীজ থেকে তুলো হাত দিয়ে খুব ধীরে ধীরে আলাদা করতে হত। আর তুলো ধোনার মেশিন আসার সাথে সাথে শক্ত বীজ থেকে খুবই সহজে সাদা তুলো আলাদা করা হতে লাগল। আমেরিকা আর ব্রিটেনের কাপড়ের বাজারে তুলোর চাহিদা ছিল প্রচুর। দ্রুত সুতো কাটার ফলে টেক্সটাইল শিল্পে নতুন জোয়ার এল। আর তার সাথে সাথে এই আমেরিকার দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে তুলোর উতপাদনের চাহিদা বাড়ল। আর সাথে সাথে দাস বেচাকেনার মাত্রাও বাড়ল- প্রচুর বিনাপয়সার মজুরের দরকার পড়ল যে!

পুরুষ আর মহিলা ক্রীতদাসের দল সূর্য ওঠার থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রাণপাত করে খাটতে লাগল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দুপুরে বিশ্রাম করতে পেত। আবার অন্যদিকে কোনো কোনো মালিকেরা রাতেও কাজ করাতে লাগল- বিশেষত যদি তা হয় পূর্ণিমার রাত। তাদের পরনে ছিল মোটা জামা যা মোটেও সুবিধাজনক ছিল না, আর পায়ে ছিল মোটা জুতো- বছরে একটিই জুটত।

তুলোর ক্ষেতে দাসেরা
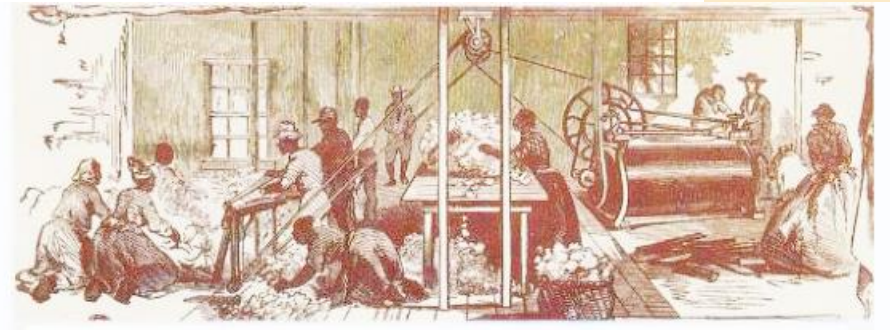
স্টীম-চালিত তুলো ধোনার মেশিন। দাসেরা তুলোর গাদা বেঁধে আঁটি বাঁধছে।

একজন পর্যবেক্ষক দাসেদের কাজ তদারকি করছে যাতে কেউ ফাঁকি না দিতে পারে। কখনো কখনো অই দাসেদের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ তাদের এই কাজে সাহায্য করত। ক্ষেতে কাজ করার সময় মজুরদের গান করতে দেওয়া হত- কারণ এতে তাদের কাজ ভাল হত। আর যখন সেখানে কোনো তুলোর বীজ লাগান, ক্ষেত জোতা, বা ফসল তোলার কাজ থাকত না, তখন তারা জমিতে অন্য কাজ করত।

অন্যান্য কাজ

উপরে দাসেরা নৌকায় তুলোর গাদাগুলো চাপাচ্ছে, মিসিসিপি নদী পারাপারের এই ছিল উপায়।

দাসেদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল অনেক দক্ষ, কেউ ছিল ছুতোর, আবার কেউ বা কামার। তাদের তাই শুধু জমিতে নয় কারখানায়ও কাজ করতে হত, কিম্বা রাস্তায়, নৌকায় বা রেল লাইনের ধারে। অথবা খনিতে। মালিকেরা খুব নিষ্ঠুর না হলে, গৃহ ভৃত্যরাই ছিল সবচেয়ে ভাগ্যবান।

এই দাসেদের তদারকি যারা করত তাদেরও বিক্রি হয়ে যাবার বা চাবুক খাবার ভয় থাকত, তবে তাদের অবস্থা অন্য দাসেদের থেকে একটু ভাল ছিল।

অন্ততপক্ষে গৃহভৃত্যদের হাতে কড়া পরে কাজ করতে হত না। তাদের জীবন কিছুটা হলেও ভাল ছিল। তাদের মধ্যে পুরুষ মানুষটি যদি বাটলার হয়ে সুন্দর পোশাক আশাক পরে কাজ করে তবে তার বউও মালিকের স্ত্রীয়ের খাস দাসী বা পরিচারিকা হয়ে কিছুটা ভাল জীবনই কাটাত।

ঘরের দাসেরা তাদের কান খোলা রাখত সারা পৃথিবীতে কি হচ্ছে জানার জন্য। খাস পরিচারিকা আর দাসেদের সব সময় ভয়ে ভয়ে টুঁ শব্দ না করে বা মাথা নীচু করে চলতে হত না।

গৃহভৃত্য হবার আরো বড় সুবিধা ছিল যে এদের মুক্তও করে দেওয়া হত। ক্ষেতে যারা কাজ করত তাদের জীবনে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া মুক্তির আর কোনো উপায় ছিল না।

গৃহভৃত্যরা ক্ষেতের দাসেদের থেকে অনেক ভাল জীবন কাটাত।

খাওয়া দাওয়া আর বিশ্রাম

ছুটি থাকলেই সব দাসেরা বিশ্রাম করতে পারত না। বেশীরভাগ দাসেদের জন্যই রবিবার ছিল বিশ্রামের দিন। কেউ কেউ আবার শনিবারের বিকেলটাও ছুটি পেত।

জমির মজুর বা ক্ষেত মজুর খাটত যে দাসেরা, তারা কখনোই ভরপেট খেতে পেত না। শুধু গৃহ ভৃত্যরা একটু ভাল খেতে পেত। চার্লস বল যিনি আগে দাস ছিলেন, লিখেছিলেন, কিছুই নিগ্রোদের জন্য গ্রাহ্য ছিল না। তাদের বরাদ্দ ছিল শুধু এক বস্তা ভুট্টা, নুন ছাড়া অথবা নামমাত্র নুনের সাথে। এর মধ্যেও অল্প স্বল্প রেশনও করা হত শাস্তিস্বরূপ।

মালিকেরা দাসেদের অবসর সময়ে মাছ ধরা, পরিষ্কার করা আর বাগান করতে উৎসাহ দিত।

নিজেদের খুশী রাখতে তারা দাসেরা নাচত আর ভগবানের নামগান করত।

তাদের ভুট্টা আর শুয়োরের মাংস রেশনে দেওয়া হত। যদি তারা মাছ বা কোনো জানোয়ার শিকার করতে পারত তাহলে তারা সবাই মিলে নাচ করত। সবাই মিলে আনন্দ করত।

তাদের যে এক টুকরো জমি মিলত, তাতে তারা সবজি ফলাত। তাদের খাবারে পুষ্টির অভাবের জন্য তাদের অনেক অসুখ হত। পুষ্টির অভাবে খুব তাড়াতাড়িই তাদের দাঁত পড়ে যেত।

আর তাদের ছুটির সময় যেটা করতে তারা সবচেয়ে ভালবাসত তা হল সম্পূর্ন বিশ্রাম। আর কিচ্ছু না।

ধর্ম

বেশীর ভাগ দাসেরাই ধর্মকর্মের মধ্যে দিয়ে শান্তি খুঁজত। তারা ভাবত ধর্ম কর্ম করলে মৃত্যুর পর তারা হয়ত বা মুক্ত হয়ে যাবে। তারা ভাবত মৃত্যুর পর তারা এক এমন প্রিথিবীতে জন্মাবে যেখানে তারা সবাই স্বাধীন ভাবে বাঁচতে পারবে। কিছু দাসেরা আফ্রিকা থেকে তাদের ধর্মও আমেরিকায় নিয়ে আসত। কখনো কখনো তা খ্রীষ্টধর্মের সাথে মিলে যেত আর তারা মনে করত এই ধর্ম তাদের কঠোর আর দুঃখ দর্দশাময় জীবন অতিবাহিত করতে সাহায্য করবে।

ফ্রেড্রিক ডগলাস, মানবিক অধিকারের লড়াইয়ে এক মহান ব্যক্তিত্ব, তিনি প্রার্থনা করতেনঃ 'আমাদের এই দাসের জীবন অন্ধকূপের মত এক নরকের জীবন। ভগবান, আমায় বল, কেন আমি দাস হয়ে বাঁচব?
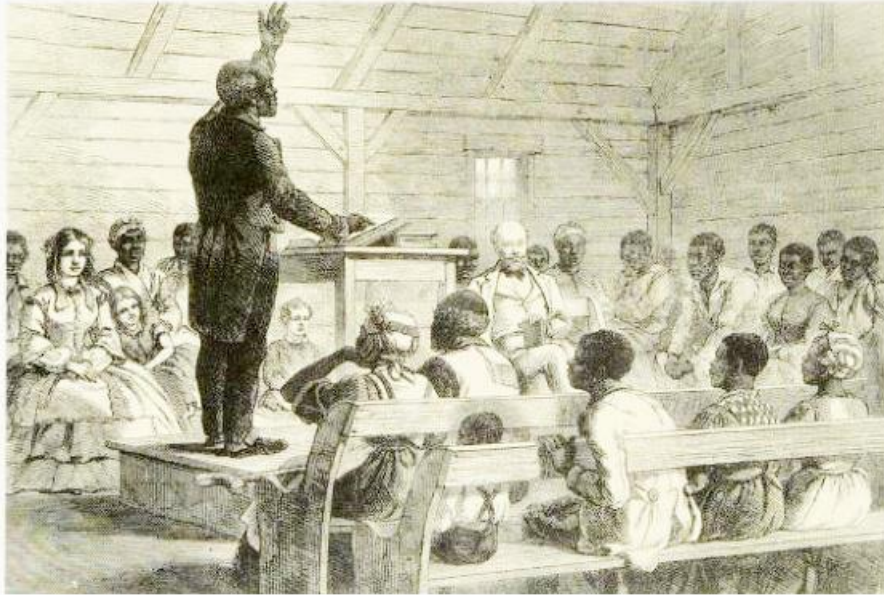
দাসেরা আর তাদের মালিকেরা এক ধর্মীয় উপদেশ শুনছে।

মারা যাবার পর তাদের কি হত? রাতের অন্ধকারে তাদের কবর দেওয়া হত।

ইসাবেল বাম্‌ফ্রি, যিনি পালিয়ে গেছিলেন, উত্তরের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে তিনি লোকেদের দাসেদের জীবনগাথা শোনাতেন।

দশ জন লোক মিলে রাতের অন্ধকারে একটা মৃতদেহ কবর দিত যাতে তাদের কাজে কেউ বাধা না দেয়। পরে তারা স্মরণ সভা রাখত আর অনেক আনন্দ ফুর্তিও করত মৃত মানুষের জন্য এই কারণে যে সে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। অনেক দাসেদের মধ্যেই ধর্ম মানে ছিল গান গাওয়া। তাদের গান গুলো ধার্মিক গান হিসাবে পরিচিত ছিল। কিছু নিগ্রো ধার্মিক গান যেমন "Deep River" আর "Swing Low Sweet Chariot" আজও অনেক গাওয়া হয়।

শাস্তি

চাবুক মারা ছিল দাসেদের অন্যতম শাস্তি।
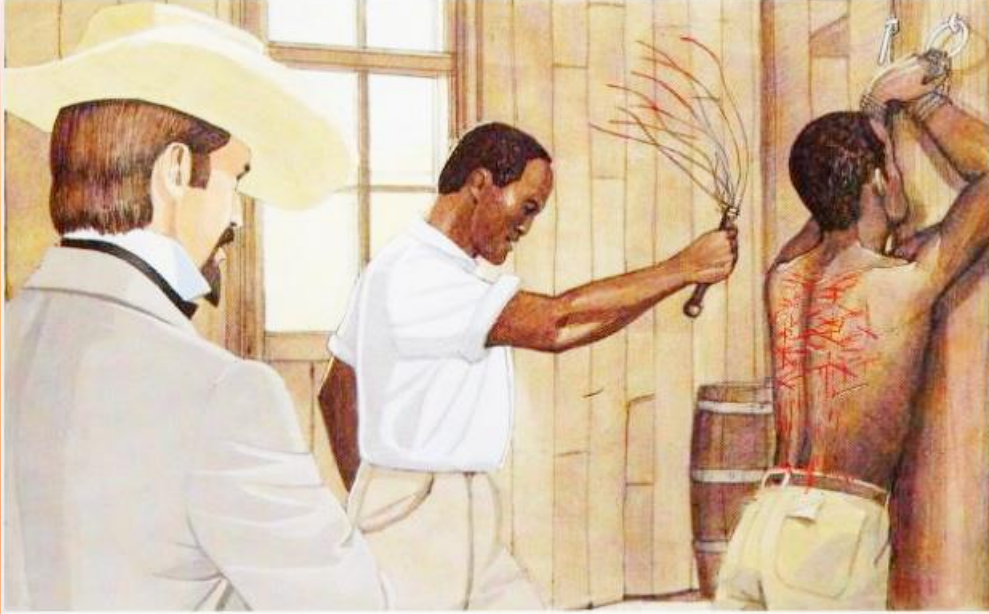
পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া আর অন্য কোথাও বিক্রি হয়ে যাওয়া যদিও সবচেয়ে খারাপ শাস্তি ছিল, তাও চাবুক মারা ছিল রোজকার শাস্তি। পুরুষ দাসেদের আর কখনো কখনো মেয়ে দাসদেরও কপালে জুটত নৃশংস চাবুকাঘাত। মালিকেরা আর পরিদর্শকেরা তো মারতই, এমনকি লোকেদের ভাড়াও করা হত দাসেদের মারার জন্য।

চাঁচাছোলা চাবুক দিয়েই আঘাত করা হত। কম করেও পনেরো থেকে কুড়ি বার তো মারা হতই। পালিয়ে যাওয়া দাসেরা ধরা পড়লে আর যদি কেউ সত্যি কোনো অন্যায় করত তাহলে তো কম করে ১০০ চাবুকাঘাত পড়তই। আর তাদের পিঠটা আঘাতে আঘাতে একেবারে ঝাঁঝড়া করে দেওয়া হত।

মালিকেরা তাদের দাসের ঘা পেকে গেলে তা জলদি সারাবার জন্য ঘায়ের উপর নুন জল ঢেলে দিত। এর যন্ত্রণা তো চাবুকের আঘাতের থেকেও মারাত্মক ছিল। এছাড়াও তাদের চেন দিয়ে বেঁধে লোহার কলার পড়িয়ে দেওয়া হত যাতে ছিল কাঁটা দেওয়া। এর ফলে সে শুয়ে আরামও করতে পারত না।

দাসেদের জন্য সবচেয়ে বড় অন্যায় ছিল শ্বেতাঙ্গকে আঘাত করা বা করতে চাওয়া। এর জন্য একজন দাসকে চাবুক মারতে মারতে মেরেও ফেলা হত যাতে এটা অন্য দাসেদের জন্য উদাহরণ স্বরূপ থেকে যায়, যাতে আর কেউ এই ধৃষ্টতা না দেখায়। জোসিয়া হেনসনের বাবা তার মা কে একজন শ্বেতাঙ্গ পরিদর্শকের খারাপ নজর থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তাকে ১০০ চাবুকাঘাত করা হয়, তার ডান কানটিকে একটা পোস্টের সাথে পেরেক দিয়ে আটকে।

কখনো কখনো দাসেদের খামারের গবাদি পশুদের সাথে রাখা হত শাস্তিস্বরূপ।

অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি দিয়ে দাসেদের শায়েস্তা করা হত।

পলায়ন!

স্বাভাবিকভাবেই, অনেক দাসেরাই, বিশেষকরে যারা স্বাধীন রাজ্যের আশে পাশে থাকত পালিয়ে যাবার, রাস্তা খুঁজত। ধরা পড়ে গেলে নৃশংস শাস্তি পেতে হবে জেনেও তারা পালানোর প্ল্যান করত, আর শতাধিক দাসেরা প্রতি বছর পালিয়েও যেত।

অনেকেই পাতাল রেল নামের এক ভয়ঙ্কর সাহসী সংস্থার সাহায্য নিয়ে পালাত। এই সংস্থাটি সেই শ্বেতাঙ্গ মুক্তিবাদীরা আর কালো প্রাক্তন দাসেরা চালাত যারা অনেকদিন ধরেই দাসেদের পালাতে সাহায্য করত আর তাদের লুকাবার জায়গা করে দিত। ভয়ানক সাহসী এক প্রাক্তন দাস, হ্যারিয়েট টুবম্যান ৩০০ 'র ও বেশী দাসকে মুক্ত করেছিলেন।

হ্যারিয়েট টুবম্যান

প্রাক্তন দাসেরা সবসময় যে উত্তরের রাজ্যগুলোতে বিনা বাধায় পালিয়ে যেতে পারতেন এমনটা নয়। এর এক প্রধান কারণ ছিল এরা যাওয়ায় শ্বেতাঙ্গরা নিজেদের কাজ চলে যাবার ভয় পাচ্ছিল, নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিল। তাই উত্তরের রাজ্যগুলি যে দাসেদের জন্য বিপদমুক্ত ছিল তা নয়। এই উত্তর আর দক্ষিণের বিভাজন দূর করার জন্য এক নির্মম কঠোর আইন পাস হল যাতে বলা হল যেসব দাসেরা দক্ষিণের রাজ্যগুলো থেকে উত্তরে মুক্তি পাবার জন্য যাবে, তাদের আবার ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হত। তাই অবস্থা এমন দাঁড়াল যে দাসেরা স্বাধীন হবার জন্য কানাডা চলে যেত। তার কারণ কানাডা ছিল ব্রিটিশদের অধীনে আর ব্রিটেনে দাসপ্রথা ততদিনে বিলুপ্ত হয়ে গেছিল।

পালিয়ে গিয়ে দাসেরা জনসমক্ষে উত্তরের লোকেদের আর ইউরোপীয়দের তাদের দুর্দশাময় জীবনের কথা শোনাত, 'আমি আমার মাথা, পা, হাত আর শরীরটা আমার মালিকের কাছ থেকে চুরি করে পালিয়ে এসেছি এখানে। ' ফ্রেড্রিক ডগলাস এক দাসপ্রথা বিরোধী সম্মেলনে এই কথা বলেন।

পালিয়ে যাওয়া দাসেরা যদি ধরা পড়ত তাহলে ভয়ানক শাস্তি দেওয়া হত।

একটি পোস্টার যাতে বোস্টনে পালিয়ে আসা দাসেদের আবার ধরা পড়ে যাবার জন্য সচেতন করা হচ্ছে।

উপরেঃ মুক্তিবাদীদের এক প্রকাশনা ছিল The Liberator

দাসেদের বিদ্রোহ

আমেরিকাতে গুটিকয়েকই দাস বিদ্রোহ হয়েছে।
যতগুলো বিদ্রোহ হয়েছে তার মধ্যে সফল হয়েছে খুবই কম।

দাসেদের উপর কড়া নজর রাখা হত। এর কারণ মূলত তাদের শরীর স্বাস্থ্যও মোটেও ভাল যেত না অতিরিক্ত খাটুনি আর অপৌষ্টিক খাবার খাবার ফলে। তাই বিদ্রোহ প্ল্যান করা খুব সহজ ছিল না। আর উত্তরে মুক্তিবাদীদের আন্দোলনের জেড়ে মালিকেরা খুব সচেতন থাকতেন।

তাই দাস বিদ্রোহ বা আন্দোলন সচরাচর সফল হত না। ১৭৪১ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে মাত্র ৫০ টা আর ১৭৯১ থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যে ২১০ টা দাস বিদ্রোহ হয়, কিন্তু এর বেশীর ভাগই খুবই ছোট স্তরে।

এদের মধ্যে সবচাইতে বড়টিও বিরাট মাপের কোনো বিদ্রোহ ছিল না, তবু এটাই শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে এক ভয় তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। ন্যাট টার্নার ছিলেন এর প্রধান নেতা। তিনি মানতেন যে ভগবান তার সহায় আছেন। কুঠার আর কোদাল, আর বন্দুক যা তারা জোগাড় করতে পেরেছিল, সেই দিয়ে লড়াই করেছিল তারা। ন্যাট আর ৭০ জনের মতন দাসেরা মিলে পঞ্চাশের মত শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, মহিলা, আর বাচ্চাদের মেরে ফেলে। তারপর তারা জঙ্গলে আশ্রয় নেয় প্রায় ছ'সপ্তাহ। এই বিদ্রোহ থামে যখন ন্যাট টার্নার আর তার ষোল জন সাথীকে ধরা হয় আর ফাঁসি দেওয়া হয়। এই আন্দোলন চলাকালীন অনেক কালো নিগারদের তাদের শ্বেতাঙ্গ মালিকেরা অকথ্য অত্যাচার করতে থাকে। এই বিদ্রোহ ব্যররথ হবার পর দাসেদের অবস্থা আর খারাপ হয়। তাদের প্রেস আর কথা বলার অধিকার খর্ব করার জন্য আইন ও পাস হয়।

ন্যাট টার্নারের ধরা পরা আর গ্রেফতার

দাসপ্রথার অবিসান

উনিশ'শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে, দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন একদম চরমে গিয়ে পৌঁছাল।উত্তরে দাসপ্রথা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণের লোকেরা এই প্রথা রক্ষার পক্ষে আরোও সোচ্চার হয়ে উঠল। গোটা আমেরিকা এই বিষয় নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। আর এর পরিণতি হল ১৮৬১-৬৫ সাল জুড়ে গণযুদ্ধ।

১৮৬৩ সালে, রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন, উত্তরের রাজ্যগুলোর নেতা, যাঁর কারণে সব দাসেরা মুক্ত হয়ে গেছিল।

কিন্তু গণযুদ্ধ আরও দুবছর চলেছিল। তারপর উত্তরের রাজ্যগুলো দক্ষিণের উপর জয় লাভ করল। দাসেরা মুক্ত হয়। যদিও লিঙ্কনকে এরপর খুন করা হয় আর দাসেদের মুক্ত করা হয়, তবে দাসেদের মুক্তির পর তাদের জীবন আর আগ্রে জীবনের মধ্যে খুব বেশী ফারাক ছিল না। সাম্প্রতিক কালে ঐ দাসেদের কৃষ্ণাঙ্গ উত্তর পুরুষেরা শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের মত সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার পায়।

মুক্ত দাসেরা লিঙ্কনের ঘোষণার পর উত্তরের দিকে যাচ্ছে

সমাপ্ত